বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, শীত সংখ্যা, পৌষ ১৪৩২/ডিসেম্বর ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43ii.002

নজরুলের ছোটগল্প : লোকজচেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান

তাশরিক-ই-হাবিব*

সারসংক্ষেপ

কবি ও গীতিকার হিসেবে সমধিক পরিচিত কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল সত্তা উন্মোচনের প্রথম সাহিত্যিক অবলম্বন ছিল ছোটগল্প। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রাতিস্বিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে আড়ালে রয়ে গেছে, সংখ্যানুপাতিক স্বল্পতা ও সমালোচনার বিষয় হিসেবে নির্বাচনে গবেষক-সমালোচকদের যথেষ্ট অনাগ্রহবশত। এ প্রবন্ধে ফোকলোরকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তাঁর গল্পসমূহকে পাঠ করার প্রচেষ্টা রয়েছে। নজরুলের সাহিত্যচিন্তার কেন্দ্রমূলে ছিল পরাধীন দেশের গণমানুষের প্রতি সহানুভূতি ও দরদ, তাদের শৃঙ্খলিত জীবনযাত্রা মোচনের দুর্বার প্রচেষ্টা এবং শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধী মনোভঙ্গি। অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্গত বাংলা ভূ-ভাগের ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁর বিভিন্ন গল্প পাঠপূর্বক অনুধাবন করা যায়। নজরুলের বিভিন্ন গল্প নিবিড় পাঠের আলোকে বাংলার লোকজচেতনার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর সদিচ্ছা ও সৃষ্টিশীল শিল্পসামর্থ্যের তাৎপর্য অনুসন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য।

চাবি শব্দ : নজরুল, লোকজ উপাদান, লোকজ চেতনা, ছোটগল্প।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি ও গীতিকার, যুগপ্রতিম প্রাবন্ধিক ও কথাশিল্পী। যদিও কবিতা ও গানের ভুবনে তিনি কালজয়ী মর্যাদায় আসীন, তবে বাংলা সাহিত্যভুবনে তাঁর পথ চলার অবলম্বন ছিল ছোটগল্প।[১] তাঁর সাহিত্যচর্চার আদর্শ ও অনুধ্যানে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ কায়িক শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমর্থন, আশাবাদ এবং দিনবদলের অঙ্গীকার বরাবর লক্ষণীয়। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর বিভিন্ন গল্পে লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনচর্চা ও জীবিকানির্ভর সংগ্রামশীলতার অকৃত্রিম চালচিত্র বিভিন্ন লোকজ উপাদানে[২] সমৃদ্ধ লোকজচেতনার অনুষঙ্গে[৩] রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন ছোটগল্পে তিনি বাঙালি লোকজীবনসংলগ্ন বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, প্রণয়-বিরহ, আবেগ ও স্বপ্ন-প্রত্যাশার রূপায়ণে একান্ত আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর কালজয়ী উপন্যাস *মৃত্যুক্ষুধা*ও (১৯৩০) এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে গ্রামীণ লোকসমাজের অন্তর্গত কায়িক শ্রমজীবী মানুষের অবলম্বিত লোকসংস্কৃতির বিশ্বস্ত শিল্পভাষ্য লক্ষণীয়। অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে (এমনকি বীরভূমও) রচিত এসব গল্পে গ্রাম-নগর-মফস্বলের পরিসরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাভুক্ত বাসিন্দাদের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির রূপায়ণ ঘটেছে। লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোকাচার, লোকসাহিত্য, কিংবদন্তি, পুথিসাহিত্য, লৌকিক ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকভাষা প্রভৃতি লোকজ উপাদান নজরুলের গল্পসমূহে তাৎপর্যবহ মাত্রায় উন্নীত।

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এক্ষেত্রে বাল্যকাল থেকে পরিণত বয়সকালীন অর্জিত অভিজ্ঞতা, গণমানুষের শ্রমক্লিষ্ট জীবিকা ও মাটিঘেঁষা প্রকৃতিলালিত লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ তাঁর সৃষ্টিশীল মানসিকতাকে অবিরাম অনুপ্রাণিত করেছে। ছোটবেলা থেকেই তিনি জীবনসংগ্রামের তাগিদে ও আন্তরিকতাবশত আমজনতার সঙ্গে মিশেছেন। লেটোর দলে গান করা ও পুথিপাঠ, মক্তবে ইমামতি, মসজিদের মুয়াজ্জিনের কাজ, মাজারের খাদেমগিরি, রুটির দোকানের কর্মচারীর চাকরি, সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে যাওয়া – প্রভৃতি কর্মব্যাপ্তির মাধ্যমে[৪] তিনি লোকসমাজের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন। নজরুলের সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রমূলে ছিল গণমানুষের কল্যাণ, তাদের সুস্থ, নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত জীবনের প্রত্যাশা। সেকারণেই তিনি সাহিত্যসাধনার অবলম্বন হিসেবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাবশত বিভিন্ন ছোটগল্প লিখেছেন।

১.১ সমকালীন কথাসাহিত্যে বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চায় নজরুলের স্বাতন্ত্র্য

নজরুলের সমকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোকুল নাগ, মণীশ ঘটক, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কথাশিল্পী কলকাতা মহানগর ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে লেখার প্রধান বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, নরওয়েজীয় ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা' প্রভৃতি পত্রিকায় সাহিত্যচর্চাকারী নাগরিক পরিমণ্ডলের লেখকদের লেখনীতে সমাজের শিক্ষিত, অভিজাত, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষদের এড়িয়ে সমাজের নিচুতলার অবহেলিত ব্রাত্য জনজীবনকে বাস্তবানুগভাবে উপস্থাপনের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। বিবিধ সামাজিক অসংগতি, জীবনধারণের প্রতিকূল পরিবেশ, সমকালীন দৈশিক পরিস্থিতিতে লাঞ্ছিত মানবতার নিষ্পেষণে অস্থিরচিত্ত-সংবেদনশীল নতুন সাহিত্যিক প্রজন্ম যুগের দাবিকে বাস্তবায়নের তাগিদেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সমাজে ব্রাত্য-অপর-ইতরজনকে সাহিত্যের পাতায় যথাযোগ্য গুরুত্ব সহকারে রূপাঙ্কনে অন্তর্নিবিষ্ট হন। এক্ষেত্রে তাঁদের শিল্পাভিজ্ঞানে বিশেষ তাৎপর্যবহ বিবেচিত হয়েছিল সনাতন, প্রথাগত সাহিত্যাদর্শের প্রতি বৈরাগ্য ও সতর্ক অনীহা :

> রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল "কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিম্নগত মধ্যবিত্তদের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।[৫]

নজরুলও নিঃসন্দেহে এ মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে নজরুলের লেখকসুলভ স্বাতন্ত্র্য অনুধাবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি হলো তাঁর সামাজিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা। কল্লোল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি বা উত্তরসূরি কেউই নজরুলের মতো নিবিড়ভাবে লোকসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মৃত্তিকাস্নাত অনুভবকে নিত্যদিনের জীবনযাপনে, পারিবারিক সংকটময় আবহে, জীবনের সংগ্রামশীল পর্যায়গুলোতে ধারণ করেননি। এদিক থেকে নজরুলের অভিজ্ঞতা, মনস্বিতা এবং শিল্পবোধ বহুলাংশেই লোকমানুষের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক ভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভবঘুরে, উন্মূলিত মানুষদের নিয়ে লিখিত কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের লেখনীকে নজরুল অতিক্রম করেছেন অবিভক্ত ভারতের বিভিন্ন গ্রাম-শহরকেন্দ্রিক গল্প ও উপন্যাস লিখে। পূর্বোক্ত লেখকদের গল্পে-উপন্যাসে বিশেষভাবেই কলকাতা শহর এবং এর অন্তর্গত রাস্তাঘাট, গলি, বস্তি এবং সংলগ্ন স্থানসমূহ অনেকটা রেখাচিত্রধর্মী ভঙ্গিতে আভাসিত। অথচ

নজরুলের বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসে বিশ শতকের ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসিত পূর্ববঙ্গ ও নদীয়া-কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লা, রাস্তঘাট, পুকুর-ঘাট, দোকানপাট, হাট-বাজার, লোকালয়, এমনকি এতদঞ্চল ছাড়িয়ে রানাঘাট, কলকাতা, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, ময়মনসিংহ ও বরিশাল এবং অন্যদিকে বীরভূম, রেঙ্গুন ও ওয়ালটেয়ারকে নিয়ে বিন্যস্ত সুবিশাল ভৌগোলিক ব্যাপ্তিবদ্ধ কুশীলবদের সামগ্রিক জীবনপ্রবাহ গ্রন্থিত। এ পর্যায়ে আমরা নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে রূপায়িত লোকজ উপাদানসমূহের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে লোকসমাজভুক্ত বাসিন্দাদের লোকজচেতনার রূপরেখা অন্বেষণে অগ্রসর হব।

১.২ লোকবিশ্বাস

লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উপাদান লোকবিশ্বাস, যার সঙ্গে আদিম কৌমজীবী মানুষের সম্পৃক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে সভ্যতার উন্মেষলগ্নে। যতই সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, পারিপার্শ্বিক প্রতিবেশ ও সামাজিক বাস্তবতা, ভৌগোলিক পরিসর ও লোকসমাজের গড়ন, ভাবনা-মানসিকতা অনুযায়ী লোকবিশ্বাসের ধারায় রূপান্তর ঘটেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস যখন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নিকট কোনো কারণে স্বীকৃতি পায় এবং যুগ যুগ ধরে তাদের আচার-আচরণ, আলাপ, এমনকি মনোলোকেও প্রভাব বিস্তার করে, শুধু তখনই তা লোকবিশ্বাস হিসেবে গণ্য হয়। বরুণকুমার চক্রবর্তীর মতে, 'সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনো লোকবিশ্বাসে পরিণত হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে লোকবিশ্বাসের মূল পার্থক্য এখানেই।'[৬] লোকবিশ্বাস যে সর্বদাই অতীত ধ্যান-ধারণা ও ভাবনাকেন্দ্রিক হবে, তা নয়। বরং এটি সাম্প্রতিক বিষয়কে ভিত্তি করেও গড়ে উঠতে পারে। মূলত ইহলৌকিক শুভাশুভ বিবেচনাই এর গড়ে ওঠার অবলম্বন। গ্রামীণ লোকমানসে লোকবিশ্বাসের প্রভাব অনস্বীকার্য। কারণ শিক্ষাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার প্রতিক্রিয়াবশত বহু যুগ ধরে প্রচলিত এসব লোকবিশ্বাসের দ্বারস্থ হয়। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনে যেসব ঘটনা ঘটার পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে কার্যোদ্ধারে সহায়তা করেছিল বলে সে অনুধাবন করে, পরবর্তীকালে পুনরায় সাফল্য অর্জনের জন্য সে ঐ লোকবিশ্বাসে অটল থাকে। নজরুলের একাধিক ছোটগল্পে এসব প্রসঙ্গের উল্লেখ লক্ষণীয়। যেমন– 'পদ্ম-গোখরা' গল্পের শুরুতেই রসুলপুর গ্রামের মীর সাহেবের পরিবার সম্পর্কে প্রতিবেশীদের বিভিন্ন গুজব-রটনা লোকবিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত হয়। এর মূলে রয়েছে পরিবারটির বর্তমানে বিলীন আর্থিক উন্নতি ও অতীতের সমৃদ্ধ অবস্থা আকস্মিক পুনরুদ্ধারের বৃত্তান্ত। মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে ভোগবিলাসের প্রতিযোগিতাজনিত কারণে এ জমিদার পরিবারটি দশ বছর পূর্বে যে দৈন্যের শিকার হয়েছিল, তা থেকে তাদের আকস্মিক উত্তরণজনিত গুজব লোকবিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছেছে। গল্পের শুরুতেই লেখক এর কারণ জানিয়েছেন। জ্বিনের বা যক্ষের ধন প্রাপ্তিই যে মীর পরিবারের রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠার কারণ, এর পক্ষে তারা কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। কিন্তু বহুজনের মাঝে ব্যাপারটি ছড়িয়ে যাওয়ায় এর সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের প্রশ্নটি এক্ষেত্রে বিবেচ্য ছিল না।

এ গল্পে পুনর্জন্মে বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা লোকধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বারা প্রভাবিত। বিয়ের এক বছর পর জোহরার যমজ ছেলেদ্বয়ের আঁতুড়েই মৃত্যুবরণের ঘটনাটি তার মাতৃসত্তায় চরম বেদনা ও হাহাকারের উদ্ভব ঘটায়। নারীর মাতৃরূপ যে স্নেহ-মমতা ও অনুরাগের মাধ্যমে সন্তানের প্রতি নিবিড়ভাবে প্রকাশিত হয়, তা একইসঙ্গে তার জৈবিক ও অন্তর্গত ভালোবাসার সহজাত স্ফুরণবিশেষ। জোহরার এ ভাবাবেগ ও মাতৃত্বময় আকুলতা সন্তানকে গর্ভে ধারণের পরিণতিতে উত্তরোত্তর বাড়লেও অকালেই তাদের মৃত্যুবরণ তার মাতৃহৃদয়ে প্রচণ্ড শোক ও অন্তর্দাহ জাগ্রত করে। জোহরার অতৃপ্ত মাতৃসত্তা তাই শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত বাস্তুসাপরূপী জোড়া পদ্ম-গোখরার প্রতি মাতৃস্নেহে আকুল হয়ে ওঠে। সেগুলোকে নিজের যমজ ছেলে ভেবে দুধপান করানো, নির্ভয়ে কাছে টেনে নিয়ে বাৎসল্য প্রকাশ ছিল সেই ভাবাবেগেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু তার অন্তর্লোকে সন্নিহিত এ আবেগের উৎস মূলত সনাতন ধর্মের পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ। ইসলাম ধর্মে এমন ধারণা প্রচলিত নয়। তবে সনাতন ধর্মে পুনর্জন্মের বা জন্মান্তরবাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ব্যক্তির কৃতকর্মকে পাপ ও পুণ্যের নিরিখে বিবেচনাপূর্বক দায়মুক্তির বিধান অনুসৃত। মূলত নির্বাণ বা পরম মুক্তিলাভই পুনর্জন্মবাদের অভীষ্ট, যা সনাতনী মূল্যবোধের অন্যতম ভিত্তি। ইহজীবনের ব্যাপ্তি যে একটিবারের মানবজন্মেই সম্পন্ন হয়ে যায়, জীবনের এ নশ্বরতা বা ক্ষণস্থায়িত্বের বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া থেকেই সম্ভবত এ ভাবনার উত্থান, যা পরবর্তীকালে সনাতন ধর্মের কাঠামোতে পুনর্জন্মের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়। এ ধারণা অনুযায়ী, মোক্ষ লাভ করার পূর্ব অবধি মানবাত্মাকে অজস্রবার ভিন্ন ভিন্ন রূপে এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। শুধু সৎ, নির্মোহ, প্রকৃত সাধকের পক্ষেই সৎকর্মের গুণে মোক্ষ অর্জন করা সম্ভব এবং তার ক্ষেত্রে পুনর্জন্মের চক্রাকার আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায়।[৭] এ গল্পে জোহরার মৃত ছেলেদের পদ্ম-গোখরাজোড়ারূপে ফিরে পাবার গভীর বাৎসল্যজাত আকাঙ্ক্ষায় লৌকিক ধর্মবোধের অন্তরালে সন্নিহিত মাতৃহৃদয়ের আকুতি ও স্নেহের উজ্জীবন পরিস্ফুট। সম্ভবত সনাতন ধর্ম থেকেই এ বিশ্বাস প্রতিবেশী মুসলমান সমাজে গৃহীত হয়েছে। গল্পের পরিণতি অংশে মানবী জোহরার এক জোড়া মৃত সাপ প্রসবের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি লোকমুখে ছড়ানো গুজব হলেও এর মাধ্যমে সাপদুটির প্রতি তার সন্তানরূপ বাৎসল্যজনিত সুতীব্র আকুতিই পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ সে তাদেরকে 'খোকা' সম্বোধনপূর্বক নিঃসঙ্কোচে কাছে টেনে নিয়েছিল।

১.৩ লোকসংস্কার

লোকবিশ্বাসেরই সম্প্রসারিত রূপ লোকসংস্কার[৮], যা লোকসমাজে প্রবল প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জীবনযাত্রাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কবে থেকে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের উৎপত্তি ঘটেছে সঠিকভাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও অনুমান করা যায়, সংস্কার এবং বিশ্বাস অতি প্রাচীন। লোকসংস্কারের মূলে রয়েছে লোকবিশ্বাস এবং তা অবশ্যই সমষ্টিমানুষের দ্বারা সৃষ্ট। বরুণকুমার চক্রবর্তীর অভিমত– 'লোক-সংস্কার হ'ল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে।'[৯] এর সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অধিক ঘনিষ্ঠ। লোকসংস্কারের মূল নিহিত থাকে কোনো জাতির সমষ্টিচেতনার গভীরে এবং ঐহিক শুভাশুভ

ভাবনাই এর অভীষ্ট। তবে লোকবিশ্বাসের সঙ্গে এর মৌলিক ব্যবধান হলো এর সঙ্গে বিভিন্ন আচার-আচরণও সম্পৃক্ত থাকে। লোকসংস্কার সমষ্টিমানুষের জন্য সৃষ্ট এবং যথাযথভাবে পালিত না হলে বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা মানসিক ভীতি ও অস্বস্তিমূলক। লোকবিশ্বাসের চেয়ে লোকসংস্কারের পরিধি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে উল্লিখিত বিবিধ লোকসংস্কারের রূপায়ণ ঘটেছে।

১.৩.১ নারীর প্রতি আরোপিত মূল্যবোধ ও অনুশাসন

'জিনের বাদশা' গল্পে নারীর প্রতি আরোপিত মূল্যবোধ বিষয়ক লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় ঐ পরিবারের পুত্রবধূ জোহরাকে কেন্দ্র করে। এক্ষেত্রে বাঙালি নারীসমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত 'লক্ষ্মী' বিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন রূপায়িত। সনাতন ধর্মে 'লক্ষ্মী' ধন, সমৃদ্ধি, শ্রী ও কল্যাণের দেবী। রূপসী, সৎ গুণের অধিকারী, মিশুক, যত্নশীল, সংসারের প্রতি মনোযোগী ও পরের সেবায় নিয়োজিত নারীকেই 'লক্ষ্মী' মেয়ে বা বধূ হিসেবে অভিহিত করা হয়। তার আগমনে সংসারের আয়-উন্নতি হয়, সুসংবাদ আসে, বিপদ ও সমস্যা দূরীভূত হয়। 'পয়' বা শুভ, মঙ্গলের আধার সেই নারী। কুতুবপুরের সৈয়দ সাহেবের একমাত্র মেয়ে জোহরাকে মীর পরিবারের একমাত্র ছেলে আরিফের স্ত্রী হিসেবে বিবাহের মাধ্যমে বরণ করে নেয়ার ঘটনাটি এক্ষেত্রে লোকবিশ্বাস গড়ে ওঠার কারণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য এরূপ ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে, তার ইঙ্গিত লেখক পূর্বেই দিয়েছেন। কারণ জোহরার রূপের প্রশংসা চারপাশের গ্রামে প্রচারিত হয়েছিল। আরিফের সঙ্গে তাকে দারুণ মানিয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠানে আগত মেহমানদের উচ্চ প্রশংসাই মূলত জোহরার শাশুড়ির মনে এ লোকবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, তার পুত্রবধূ লক্ষ্মী ও পয়া (সৌভাগ্যবতী) নারী। কারণ তার আগমনের পর থেকেই সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছিল। যেমন– প্রথমত জোহরার শাশুড়ি ভেবেছিল, তার অসুস্থতা থেকে মুক্তি মিলেছে জোহরারই কারণে। এ ঘটনা জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন জোহরা শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের দেয়ালের ফাটলের ভেতর বাদশাহি আশরফিতে ভরা পেতলের একটি কলস খুঁজে পায়। "কলসিতে সোনার মোহর দেখিয়া আনন্দে তাহারা ... অশ্রুসিক্ত চোখে বারে বারে বলিতে লাগিলেন, 'সত্যিই মা, তোর সাথে মীর বাড়ির লক্ষ্মী আবার ফিরে এলো!' "[১০] শুধু তাই নয়, আরিফ মক্তবের শিক্ষকতা ছেড়ে যখন ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, তখনও স্ত্রী জোহরার প্রতি বিশেষ ধরনের বিশ্বাস তার মনে জন্মেছিল। গল্পকার জানিয়েছেন, "বধূর 'পয়' দেখিয়াই বোধ হয়–আরিফ তাহারই কিছু টাকা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিল। ব্যবসায়ে আশার অতিরিক্ত লাভ হইতে লাগিল।" [১১] এমনকি শ্বশুরবাড়িতে লোভী শ্বশুর-শাশুড়ির চক্রান্তে বিষমেশানো খাবার খেয়েও ডাক্তারি চিকিৎসায় প্রাণ রক্ষা করতে পেরে আরিফ ও তার মা-বাবা জোহরাকেই যে কৃতিত্ব দিয়েছিল, লেখক তা জানিয়েছেন– 'জোহরা সত্য সত্যই পয়মন্ত, আরিফ মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি আলাপ করিয়া ফিরিয়া আসিল।'[১২] লেখক *মনসামঙ্গল* কাব্যের বেহুলা-লখিন্দর আখ্যানের বীজটিকেই সম্ভবত জোহরা চরিত্রের পুনর্গঠনে বিন্যস্ত করেছেন। স্বামীর ওপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা, প্রতিদানে ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আমৃত্যু বিশ্বস্ত থাকা, সংসারের কর্মনিপুণা গৃহবধূর ভাবমূর্তিকে ব্যক্তিত্বে ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত করার

পাশাপাশি সেবা-নৈপুণ্য-ত্যাগের মাধ্যমে আত্মনিবেদনের যে দৃষ্টান্ত বেহুলা স্থাপন করেছিল লখিন্দরকে বাঁচাতে গিয়ে, সেই পৌরাণিক ভাবাবহকেই নজরুল জোহরা চরিত্রে আরোপ করেছেন। আবার মনসা চরিত্রে প্রতিবিম্বিত জননীর মাতৃত্বময়ী রূপটিও লক্ষণীয়, যে তার সর্পসন্তানদের সর্বতোভাবে রক্ষায় সচেষ্ট। ধর্মীয় পরিচয় ভিন্ন হলেও নদীমাতৃক গ্রামীণ বাংলাদেশের বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় *মনসামঙ্গলের* বেহুলা-লখিন্দরের প্রেমাখ্যানের প্রতি নজরুলের আগ্রহ ছিল। সম্ভবত জোহরা চরিত্রটির গড়নে মনসা ও বেহুলা উভয় নারীই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

'রাক্ষুসী' গল্পে বিন্দি নামের বীরবূমের এক বাগদী গৃহবধূর বয়ানে এ বিষয়ক কিছু লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। তিন ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে তার সুখের সংসারে আচমকাই হানা দিয়েছিল রথো বাগদির 'দু-তিনটে স্যাঙ্গা করা কড়ুই রাড়ি' মেয়েটি। তার স্বামী পাঁচুর বাপকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে সে বিন্দির জমানো টাকা হাতিয়ে নেয়ার চক্রান্ত করেছিল। এর পাশাপাশি তাকেও বিয়ে করার প্রলোভন দেখিয়েছিল। বিন্দি স্বামীকে নানাভাবে বুঝিয়েও রথো বাগদির মেয়েটির প্রতি মোহ থেকে স্বামীকে ফেরাতে না পেরে একপর্যায়ে তাকে খুন করে। এ ব্যাপারে তার মনে কোনো অনুতাপ নেই। এর পরিণতিতে প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী ও আত্মমর্যাদাসচেতন বিন্দিকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'রাক্ষুসী' সম্বোধনে অভিহিত করে। পাড়ার ছেলেরা তাকে খ্যাপাত, প্রতিবেশীরা তাকে কখনো আপন ভাবত না, বরং এড়িয়ে চলত। এমতাবস্থায় সে কারাবাস শেষে বাড়ি ফিরে নয় বছর পূর্বের নিজের জীবনের মর্মন্তুদ আখ্যান প্রতিবেশী মাখনদিকে জানিয়েছিল। সমাজে কোণঠাসা এ বিধবা নারীর বয়ানে লিখিত গল্পটিতে একাধিক লোকসংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে বিন্দির জবানিতে। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ–

> আমি মনে করতুম, আর যটা দিন বাঁচি এমনি করে সোয়ামির সেবা করে, ছেলে-মেয়ে চরিয়ে, নাতিপুতি দেখে আমার হাতের নোওয়া অক্ষয় রেখে মরি; কিন্তু তা আমার পোড়া বিধাতার সইল না।[১৩]
>
> একটা দেবতার মতো লোক সিদা নরকে নেমে যাচ্ছে এক-এক পা করে, আর বেশি দূর নাই, অথচ ফিরাবার কোনো উপায় নাই। তখন তাকে হত্যা করলে কি পাপ হয়? আমি তার 'ইস্ত্রি', আমারও তো একটা কর্তব্য আছে, আমার সোয়ামি যদি বেপথে যায়, তো আমি না ফিরালে অন্য কে এসে ফিরাবে? আর সে এই রকম বেপথে গেলে ভগবানের কাছে ধর্মত আমিই তো দায়ী।[১৪]

১.৩.২ অশরীরী সংক্রান্ত

গ্রামীণ সমাজে অশরীরী বিষয়ক অজস্র লোকসংস্কার প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বিশ্বের যে কোনো দেশেই এর প্রচলন স্থানিক সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক ধরনভেদে লক্ষণীয়। জিন-পরি, কবন্ধ, ভূত-প্রেত, ডাইনি, প্রেতাত্মা, দেও-দৈত্য-দানব, পিশাচ প্রভৃতি অশরীরী সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস কালের বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বর্তমানের বিজ্ঞানশাসিত সভ্যতাতেও স্বকীয়রূপে দেশভেদে অস্তিত্বশীল। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে, লোকপুরাণে, লোককথায় ও লোকগাথায়, লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় এসবের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সমাজবিজ্ঞানী-নৃবিজ্ঞানীরা এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

আঠারো শতকের শেষভাগ থেকে পুরো উনিশ শতক অবধি দোভাষী পুথির জগৎ ও আরব্য লোককথা, বিশেষত *আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা* বা হাজার এক আরব্য রজনীর অতিলৌকিক-

অবিশ্বাস্য জগৎকে বাঙালি লোকসমাজ যে বিশ্বাসের গুণে আপস করে নিয়েছিল, তা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনি, কিংবদন্তিতে জিন-পরিকেন্দ্রিক ঘটনা ও আখ্যানের মাধ্যমে পল্লবিত হয়েছে। এর সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের অশরীরী বিষয়ক ভূত, প্রেত, পেত্নী, দানব, প্রভৃতির উপস্থিতি তার এ বিশ্বাসকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য করেছে। নামগত ভিন্নতা সত্ত্বেও অশরীরী হিসেবে এসব সত্তার উপস্থিতিকে প্রকৃতিনির্ভর, পশ্চাৎপদ, আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষাবঞ্চিত লোকসমাজ বাস্তবেরই অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ *আল কোরআন*-এ 'জ্বিন' কে নিয়ে একটি সুরা রয়েছে। এ ধর্মগ্রন্থমতে, জ্বিন হলো আগুনের সৃষ্ট অশরীরী, যাকে মানুষ সরাসরি দেখতে পায় না। লোকসমাজে প্রচলিত ধারণা হলো– গুপ্ত, অদৃশ্য, দৃষ্টির আড়ালে বিচরণকারী এ অশরীরী নির্জন স্থানে বসবাস করে, জনপদের আশেপাশে নির্জন দিনে বা ভরদুপুরে, শুনশান অন্ধকার রাতে ঘোরাফেরা করে। মানুষের বাসস্থান ও জনপদ থেকে দূরবর্তী, পরিত্যক্ত, নির্জন ও নোংরা জায়গায় এরা ঘোরাফেরা করে, রাতের অন্ধকারে এরা মানুষের পিছু নেয় এবং তার দিকে নজর রাখে। সুযোগ পেলে এরা শিশু ও নারীদের কোনো বিপদে ফেলে, কারো ক্ষতি সাধন করে। মানুষের মতো তারাও সমাজবদ্ধভাবে থাকে, তাদের আলাদা রাজ্য ও রাজা রয়েছে। তাদেরকে রাজার হুকুম মেনে চলতে হয়। এরূপ বিভিন্ন লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে বহুকাল থেকেই গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্ম ও আচরণ যুক্ত হওয়ায় কালের প্রবাহে এগুলো লোকসংস্কারে পরিণত হয়েছে। 'জিনের বাদশা' গল্পে প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত লক্ষণীয়। মোহনপুর গ্রামের মাতবর চুন্নু ব্যাপারির তৃতীয় পক্ষের ছেলে ও বিশ বছরের দুঃসাহসী যুবক আল্লা-রাখা নারদ আলি শেখের উঠতি বয়সী মেয়ে চান ভানুকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে তার পরিবারকে নানাভাবে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে জ্বিনের ছদ্মবেশে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ সমাজে জিনকেন্দ্রিক যেসব বিশ্বাস বিদ্যমান, সেগুলোকেই সে নানাভাবে অনুসরণ করে। গ্রামের বাসিন্দাদের নিকট তার দুরন্তপনা এতটাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল–

> "গাঁয়ের লোক বলাবলি করে, ও ... যদি মামদোভূত হত, তা হলেও বরং ছিল ভালো। ভূতেও বুঝি এত জ্বালাতন করতে পারে না। ... ওকে মুসলমানরা বলত, 'ইবলিশের পোলা', কায়েতরা বলত, 'অমাবস্যার জম্মিৎ!' বাপ বলত 'হালার পো', মা আদর করে বলত– 'আফলাতুন' "।[১৫]

সে নিজেকে দোভাষী পুথির নায়ক হানিফা ও চান ভানুকে জয়গুন ভেবে প্রেমের ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে তাকে অপহরণের পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা বাস্তবায়নের সুযোগ না পাওয়ায় প্রথমে জিনের বাদশা ও এরপর জলদানো সেজে সে চান ভানুকে ভয় দেখায়। কখনো বা অশরীরীর বেশে সুর করে বিলাপ তুলে কেঁদে সে রাতের বেলা চান ভানুর পরিবারকে আতঙ্কিত করে তোলে। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে এতদ্বিষয়ক কিছু প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থেকে ধারণা করা যায়, এ বিষয়ক লোকসংস্কার গ্রামীণ বাঙালি লোকসমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের প্রাত্যহিক দিনযাপনের বিভিন্ন ভাবনা, আচরণ, কর্মকাণ্ড যে এ লোকসংস্কারের দ্বারা আবর্তিত হয়, তা অনুধাবনে সহায়ক কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ:

> প্রবল ঝন্‌ঝার মতো এসে সময় সময় ঐ যে দমকা বাতাস আমাকে ঘিরে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে, ওকি তাঁরই অশরীরী ব্যাকুল আলিঙ্গন?[১৬]

সেইদিন সন্ধ্যা-রাত্রিতে বাড়ির একজন দাসী চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মা গো, ভূতে ধরলো গো! জিনের বাদশা গো! জিন ভূত!' ... এমন সময় বাড়িময় শোরগোল উঠিল,'ভূত! ভূত! য়্যাদ্দাড়িওয়ালা ভূত।'[১৭]
জিনের বাদশা, তার দৈবী বাণী, যত রকম ভূত ছিল–একানোড়ে, মামদো, সতর চোখীর মা, বেক্ষদোত্তি, কব্ধকাটা– সব মিলেও তার পরাজয় নিবারণ করতে পারলে না![১৮]

১.৩.৩ সাপ হত্যা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা

বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে টোটেম ও ট্যাবুর অস্তিত্ব লক্ষণীয়। অরণ্যচারী-প্রকৃতিনির্ভর প্রাচীন মানব সভ্যতায় গড়ে ওঠা এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবার-ধর্ম ও সমাজের নিবিড় সংযোগ বিদ্যমান ছিল। সংস্কৃতিভেদে এদের অস্তিত্ব বৈচিত্র্যময় হলেও লোকসমাজের গড়ন ও সমষ্টিমানসে প্রভাববিস্তারে টোটেম ও ট্যাবুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঙালি মুসলমান ও সনাতন সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে টোটেম ও ট্যাবুর উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'পদ্ম-গোখরা' গল্পে মানুষের পাশাপাশি একজোড়া পদ্ম-গোখরা সাপ চরিত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নদীমাতৃক গ্রামীণ বাংলা ভূ-ভাগে সাপের বসবাস সমতল কৃষি ভূমি, পার্বত্য এলাকাসহ প্রায় সবর্ত্রই লক্ষণীয়। মধ্যযুগে রচিত *মনসামঙ্গল* কাব্যের আলোকে ধারণা করা যায়, এতদঞ্চলে সাপকে সনাতনপন্থিরা যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন অনুযায়ী পূজা করে এবং মনসাকে সাপের দেবী হিসেবে অধিষ্ঠিত করেছে, এর অন্তরালে নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক কারণসমূহও সক্রিয়। টোটেম ও ট্যাবুর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো এর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। এ গল্পেও এসব প্রসঙ্গ লক্ষণীয়। যেমন– গল্পের শুরুতেই রসুলপুরের মীরসাহেব পরিবারের আর্থিক উন্নতির আকস্মিক কারণ হিসেবে আরিফের স্ত্রী জোহরার মতো 'পয়া' বা লক্ষ্মী নারীর ভূমিকাকে গ্রামবাসী গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ সে শ্বশুরালয়ের জীর্ণ প্রাসাদের ফাটলের ভেতর সাপজোড়ার ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেয়েছিল। এরপর এক কলস ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা সেখান থেকে উদ্ধারের মাধ্যমে এ পরিবারের অবস্থা যে দুই বছরের মধ্যে নাটকীয়ভাবে বদলে যায়, গল্পের ভাষ্যে লেখক তা জানিয়েছেন। কিন্তু এটিই এ গল্পের মূল প্রসঙ্গ নয়। বরং ওপরে উল্লেখিত প্রসঙ্গে গল্পের বিবরণে জানা যায়, আরিফের বাবা সাপজোড়াকে 'জাতসাপ' হিসেবে অভিহিত করে। সে আরিফকে নিষেধ করে সাপদুটিকে হত্যা করতে। গৃহে বা বাস্তু ভিটায় আশ্রিত বিধায় গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের সাপকে 'বাস্তুসাপ' হিসেবে সম্বোধন করা হয়। জাত সাপ হত্যা করলে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, এ ধারণা গ্রামীণ মুসলমান লোকসমাজে প্রতিবেশী সনাতন ধর্মের প্রভাবজাত। মনসাকে 'সাপের দেবী' হিসেবে বিবেচনায় সাপকে তার সন্তানরূপে প্রতিপালন, দুধ-কলা খাওয়ানো প্রভৃতি আচরণ গ্রামীণ পরিমণ্ডলে প্রচলিত। এ গল্পেও লক্ষণীয়, সাপজোড়া ধীরে ধীরে গৃহেই প্রতিপালিত হতে থাকে, এ পরিবারটির সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে। জোহরা সাপজোড়াকে দুধ-কলা খাইয়ে সন্তানস্নেহে প্রতিপালনে মনোযোগী হলেও ভয়ানক বিষধর এ সরীসৃপের প্রতি পরিবারের অন্যদের মনোভাব ছিল এর বিপরীত। সাপজোড়ার কারণেই স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্তির ঘটনা ঘটায় এবং জোহরার মাত্রাতিরিক্ত বাৎসল্য সম্পর্কে অবহিত তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এদের প্রহার বা হত্যা করেনি। সাপদুটিতে নিজের মৃত যমজ ছেলের সঙ্গে প্রতিতুলনাবশত মাতৃময়ী জোহরা কাছে টেনে নেয়ায় একপর্যায়ে স্বামী আরিফের সঙ্গে তার দাম্পত্যসম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। কারণ রাতের বেলাও সাপজোড়া জোহরার বিছানায় আসায়

আরিফ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর পরিণতিতে তার কাছে সাপজোড়া রীতিমতো প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে। তার মনে হতে থাকে, স্ত্রী হিসেবে সে জোহরাকে কাছে পাচ্ছে না। এর আরেক কারণ, জোহরা তার পরিবর্তে সাপজোড়ার প্রতি অধিক মনোযোগী, সন্তানস্নেহের আকুতিবশত সরীসৃপজোড়াকেই মৃত ছেলে ভেবে তাদের কাছে টানতে উন্মুখ। সেকারণেই আরিফ একবার তাকে জানিয়েছিল, সাপদুটোকে মেরে ফেলবে। কিন্তু তাতে জোহরার সম্মতি ছিল না। জোহরার মামা বিখ্যাত সর্পতত্ত্ববিদ ছিল, সেকারণেই সম্ভবত সেও সাপজোড়াকে ভয় না পেয়ে বরং পোষ মানিয়েছিল বাৎসল্যগুণে। একপর্যায়ে আরিফের সঙ্গে জোহরার অন্তর্গত সম্পর্কের টানাপড়েন বাড়তে থাকে। ছয় মাস পর বাপের বাড়ি থেকে জোহরা স্বামীগৃহে ফিরতেই সাপজোড়াও তার কাছে আসে এবং আগের মতোই তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। জোহরার শাশুড়ি এ ব্যাপারটি মানতে পারেনি। সে জোহরার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে, যদিও তার অনুপস্থিতিতে সরীসৃপজোড়া বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিল। গর্ভবতী অবস্থায় বাপের বাড়িতে অবস্থানকালে জোহরা স্বপ্ন দেখত, তার মৃত ছেলেরা দুধপানের জন্য কবর থেকে উঠে এসে তার কাছে আকুতি জানাচ্ছে। ঘটনাক্রমে আরিফের শ্বশুর রাতের অন্ধকারে সাপদুটিকে মাড়িয়ে দেয় এবং লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। গল্পের শেষভাগে জানা যায়, 'ভোর হইতে না হইতে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, মীর সাহেবদের সোনার বৌ এক জোড়া মরা সর্প প্রসব করিয়া মারা গিয়াছে।'[১৯] বাবার হাতে সাপজোড়ার মৃত্যুর ঘটনা জেনে মৃত সাপজোড়া প্রসবের পর জোহরা নিজেও মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা অবিশ্বাস্য হলেও গল্পকারের ভাষ্যে জানা যায়, ব্যাপারটি গুজব বা রটনারূপে গ্রামে প্রচারিত হয়েছে। সরীসৃপের প্রতি মানবীয় বাৎসল্য ও ভালোবাসার অসামান্য বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে গল্পকার এভাবেই এ লোকসংস্কারকে গল্পটিতে রূপায়িত করেছেন।

১.৩.৪ বিবিধ

নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে লোকসমাজে প্রচলিত অন্যান্য লোকসংস্কারের দৃষ্টান্তও রয়েছে। যেমন– অভিশাপ প্রদানের ব্যাপারটি একাধিক গল্পে উল্লেখিত। সাধারণত কোনো ব্যক্তির ক্ষতি হলে বা বিপদ ঘটলে, এমনকি সে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বা সেরূপ আশঙ্কা থাকলে যে ব্যক্তির কারণে এমনটি ঘটে বা ঘটতে পারে, তার প্রতি অভিশাপ বা বদদোয়া উচ্চারিত হয়। এর পরিণতিতে দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান না হলেও সে আপাতসান্ত্বনা পায়, দুষ্কৃতকারীর দণ্ডবিধানের প্রচেষ্টায়। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তসমূহ নিম্নরূপ :

> কড়ুইরাড়ি আঁটকুড়িরা যারা আমার সাতপুরুষের গিয়াতকুটুম নয়, ... দেবতাদের শাপের মতো এসে আমাদের সব সুখশান্তি নষ্ট করে দিলে![২০]
>
> বত্রিশ নাড়ি পাক দিলে তবে কখনো লোকের মুখ দিয়ে 'শাপমন্যি' বেরোয়![২১]
>
> পীর সাহেবের অভিশাপের ভয়ে লোকে বাড়িতে ভিড় করিতে পারিল না।[২২]

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে যথাশীঘ্র বিয়ে না দিলে পরিবারে বিপদ ঘনিয়ে আসে, এ লোকসংস্কারের দৃষ্টান্ত রয়েছে 'রাক্ষুসী' ও 'জিনের বাদশা' গল্পদ্বয়ে। প্রথমটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বাগদি নারী বিন্দি তার বড়

ছেলের বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজেছিল। সে ভাবছিল, "বড় ছেলে সোমত্ত হয়ে উঠেছে, বেথা না দিলে 'উপর-নজর' হবে।"[২৩] কারো কুনজর বা খারাপ দৃষ্টি লাগার শঙ্কাও লোকসংস্কারের অন্তর্গত। কারণ তা প্রতিকারের জন্য বিশেষ আচার পালন বা ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। 'জিনের বাদশা' গল্পে নারদ আলি শেখের উঠতিবয়সী মেয়ের প্রতি জিনের বাদশা আকৃষ্ট হয়ে রাতে বাড়িতে হানা দিলে গ্রামের মেয়েরা জানায় "'আইবো না, অত বড় মাইয়া বিয়া না দিয়া থুইলে জিন আইবো না?' " ... কেউ কেউ বলল চান ভানুর ওপর জিনের আশক হয়েছে, ওর ওপর জিনের নিজের নজর আছে। আহা, যে বেচারার বিয়ে হবে ওর সাথে, তাকে হয়তো বাসর ঘরেই ঘাড় মটকে মারবে।' "[২৪]

গ্রামীণ লোকসমাজে বিশেষ দিন-ক্ষণ মেনে শুভ-অশুভ বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দিব্যি দেওয়া, তুকতাক-বশীকরণ বিষয়ক বিভিন্ন লোকসংস্কারের প্রচলন রয়েছে। আসন্ন বিপদ কাটাতে, কখনো বা ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধকতার সমাধান হিসেবে এ লোকসংস্কারের প্রচলন লোকসমাজে পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

অশুভক্ষণ মানা –

> কি কুক্ষণে কাল-সন্ধ্যায় সে ওদের বাড়িতে পা দিয়েছিল![২৫]

অশুভ লক্ষণ–

> সেদিন সকাল হতেই আমার ডান চোখটা নাচতে লাগল, বাড়ির পিছনে অশ্বত্থ গাছটায় একটা প্যাঁচা দিন দুপুরেই তিন বার ডেকে উঠল, মাথার উপর একটা কালো টিকটিকি অনবরত টিক টিক করে আমার মনটাকে আরো অস্থির করে তুলেছিল। আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ওদের কি সংযোগ ছিল?[২৬]

দিব্যি করা ও কসম খাওয়া–

> তারপর যখন নানান্ রকমের দিব্যি করে কসম খেয়ে ফুসলিয়ে তাকে ডেকে আনতাম, তখন সে আমার লম্বা চুলগুলো নিয়ে নানান্ রকমের বাঁকা-সোজা সিঁথি কেটে দিতে দিতে বলত, 'দেখো ভাই, আর আমি কখখনো তোমায় মারব না! যদি মারি তো আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়, পোকা হয়!'[২৭]

জাদু–

> এতদিন বাঁশির এই জাদু-করা সুর কোথায় ছিল?[২৮]
>
> ছুঁড়ি যে ওকে জাদু করেছিল! একেবারে ভেড়া বানিয়ে দিয়েছিল! [২৯]

১.৪ লোকাচার

লোকাচার লোকসংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, যা বিভিন্ন ক্রিয়া ও আচরণসম্পৃক্ত। এর বিষয়বৈচিত্র্য ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও আয়োজন লোকাচার-সম্পৃক্ত বিধায় লোকসমাজের প্রাত্যহিক দিনযাপনে এর অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষণীয়। ইহলৌকিক কামনা, বস্তুগত বা বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জন প্রভৃতি এর লক্ষ্য।[৩০] বিভিন্ন প্রয়োজনে, অভীষ্ট পূরণের তাগিদে মানুষ কখনো নিজের অজান্তে, কখনো সচেতনভাবে বিভিন্ন লৌকিক আচার মান্য করে। কেননা এসব আচার-অনুষ্ঠানে সন্নিহিত থাকে বহু যুগের লোকসমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও অনুশাসন। মানুষ জীবনের সঙ্গে দৈব বা অতিপ্রাকৃত ভাবনাকে বরাবর

সমন্বিতভাবেই মিলিয়ে চলে। নিত্যদিনের চলার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতাকে সে এড়িয়ে চলতে এবং আকাঙ্ক্ষিত ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে চায়, এরই তাগিদে বিভিন্ন লোকাচারের প্রতি সে আগ্রহী হয়ে ওঠে।[৩১] লৌকিক আচারে প্রকাশ পায় ইহলৌকিক কামনারাজি। সামাজিক বিভিন্ন লোকাচার নজরুলের রচিত বিভিন্ন গল্পে লক্ষণীয়। গ্রামীণ সমাজে বিয়ের আয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক্ষেত্রে বংশগত ও পারিবারিক মর্যাদার বিষয়টিও নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। গ্রামের অভিজাত, ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিয়ের আয়োজনে প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রচলন অঞ্চল ও জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ভেদে লক্ষণীয়। গ্রামীণ বাঙালি মুসলমান সমাজেও এর প্রতিফলন ঘটে। 'জিনের বাদশা' গল্পে বর-কনের প্রথমবার নিজেদের দেখা বা দৃষ্টি বিনিময়ের আয়োজন মূলত সনাতন ধর্মের বিয়ের রীতি থেকে গৃহীত। সেখানে পূর্বনির্ধারিত লগ্ন মেনে বিয়ের আয়োজন করা হয়, যেখানে শুভ দৃষ্টি-বিনিময়, কন্যা সম্প্রদান ও অন্যান্য আচার অবশ্যপালনীয়। কোষ্ঠী বিচার, পঞ্জিকা গণনা ও দিন-ক্ষণ মেনে সনাতন বিয়ের রীতির খানিকটা অনুসরণ এ সমাজেও কালের পরিক্রমায় গৃহীত হয়েছে। এ গল্পে লক্ষণীয়, মোহনপুর গ্রামের মাতব্বরের ছেলে আল্লা-রাখা প্রতিবেশী-কন্যা চান ভানুকে পছন্দ করে এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পারিবারিকভাবেই চান ভানুর বিয়ের প্রস্তাব পাকা হয় মাজগাঁ গ্রামের ছেরাজ হালদারের ছেলের সঙ্গে। আল্লা-রাখা যে এ বিয়ের আয়োজনে বিঘ্ন ঘটাতে সচেষ্ট, তা বুঝতে পেরে 'তারা বাপ-বেটায় পরামর্শ করে ঠিক করলে–শুধু বিয়েটা হবে ওখানে গিয়ে। রুয়ৎ বা শুভ-দৃষ্টিটা কিছুদিন পরে হবে এবং শুভ-দৃষ্টির পরে ওরা বউ বাড়িতে আনবে।"[৩২] সম্ভাব্য বিপদ অতিক্রমের সমাধান হিসেবে লোকসংস্কারকে লোকাচারের মাধ্যমে বাস্তবায়নের এ দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়, যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণেরই অংশ। আবার আকস্মিক কোনো রোগ-বালাই বা বিপদ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে গরিব-অনাহারীকে দান-খয়রাতের মাধ্যমে পরিত্রাণলাভের রীতিও লোকাচার হিসেবে প্রচলিত। 'পদ্ম-গোখরা' গল্পে লক্ষণীয়, আরিফ কলেরায় আক্রান্ত হলে তার সুস্থতা কামনায় দরিদ্রদের আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি বাড়িতে মিলাদের আয়োজন করা হয়। নিজের ওপর আরোপিত বিপদ কাটাতে এভাবে অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসার প্রবণতা লোকাচারভুক্ত। 'জিনের বাদশা' গল্পের নায়ক আল্লা-রাখার নাম নির্ধারণের ক্ষেত্রেও লোকাচারের প্রভাব লক্ষণীয়। যেমন– 'চুন্নু ব্যাপারির তৃতীয় পক্ষের দুই-দুইবার মেয়ে হবার পর তৃতীয় দফায় যখন পুত্র এল, তখন সাবধানী মা তার নাম রাখলে আল্লা-রাখা। আল্লাকে রাখতে দেওয়া হল যে ছেলে, অন্তত তার অকালমৃত্যু সম্বন্ধে–আর কেউ না হোক মা তার নিশ্চিন্ত হয়ে রইল!'[৩৩] পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সন্তান হিসেবে ছেলেই যে মা-বাবার কাছে অধিক কাম্য, তা যেমন এ লোকাচারে প্রকাশিত হয়, তেমনিভাবে তার সুস্থতা ও নিরাপত্তার প্রতি অভিভাবকদের প্রত্যাশা-উদ্বেগের সমাহার এতে সন্নিহিত রয়েছে। তবে নজরুলের ছোটগল্পে যে লোকাচারের উল্লেখ সর্বাধিক, সেটি হচ্ছে ভূত-জিনকেন্দ্রিক লোকাচার। এটি গড়ে ওঠার অন্যতম কারণ হলো পারিপার্শ্বিক গ্রামীণ পরিমণ্ডল। গ্রামের নদী-পুকুর-বাঁশঝাড়, জঙ্গল, গাছপালা আবৃত স্থান, বিরান জমি, মজা পুকুর, জনবসতিহীন স্থান প্রভৃতি রাতের অন্ধকারে জনমনে যে ভয় ও উদ্বেগ জাগায়, তা বিভিন্ন অশরীরীর বিচরণক্ষেত্র হিসেবে নানাভাবে তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। জিন, ভূত, পরি, ডাইনি, রাক্ষস,

দেও-দৈত্য, পিশাচ সম্পর্কিত বিবিধ প্রাচীন কাহিনি, লোককথা, কিংবদন্তি নানাভাবে লোকমানসে প্রভাব ফেলে। এছাড়া ধর্মীয় মূল্যবোধ-অনুশাসনও এ ধরনের লোকসংস্কারের অংশ হয়ে ওঠে। হিন্দু সমাজে আত্মা, ভূত-প্রেত সংক্রান্ত ধারণার পাশাপাশি মুসলমান সমাজের জিন-পরি প্রভৃতি দোভাষী পুথি, আরব্য লোককথার দ্বারা বাহিত হয়ে গ্রামীণ বাঙালি জনমানসে ঠাঁই পেয়েছে। 'জিনের বাদশা' গল্পে এ বিষয়ক দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়। চান ভানুকে বিয়ে করার জন্য প্রতিবেশী যুবক আল্লা-রাখা জিনের বাদশার ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। কিন্তু এ বৃত্তান্ত চান ভানু বা তার মা-বাবা জানত না। তাই রাতের বেলা বাড়িতে জিনের বাদশার আগমনে তারা ভীত হয়েছিল। এর প্রতিকার হিসেবে তারা 'তওবা আস্তাগফের' দোয়া পড়ছিল ও আল্লাহর নাম জপছিল। লোকমুখে এ ঘটনা প্রচারিত হলে সম্ভাব্য বিপদ কাটাতে মসজিদের মৌলবিকে দিয়ে পবিত্র কোরআন পাঠ ও মিলাদের আয়োজন করেছিল। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ এক রাতে একটি কালো বিড়াল তালগাছের ওপর থেকে তাদের বাড়ির জানালায় এসে পড়লে তারা ভেবেছিল, চান ভানুকে নিয়ে নতুন কোনো ঝামেলা হতে পারে। কালো বিড়াল অমঙ্গলের প্রতীক, এমন লোকবিশ্বাস গ্রামীণ সমাজে বহুল প্রচলিত। ফলে চানভানুর বিয়ে একমাস পিছিয়ে দিয়ে এরপর তার অভিভাবকরা বিভিন্ন গ্রামের মন্ত্র-সিদ্ধ গুণীনদের দিয়ে বাড়ির ভূত-বিষয়ক উপদ্রব বন্ধ করার চেষ্টা চালায়। এ গল্পে জলদানো বিষয়ক লোকাচারের দৃষ্টান্তও রয়েছে। নদীতে গোসল করতে গিয়ে চান ভানু জলদানোর কবলে পড়লে প্রতিবেশী যুবক আল্লা-রাখা তাকে উদ্ধার করে। সে যে চান ভানুর বিয়ে ভাঙতে ইতঃপূর্বে জিনের বাদশা ও জলদানো সেজে তাকে ভয় দেখিয়েছিল, তা কেউ জানত না। সেদিনের পর থেকে সে বাড়িতেই মায়ের তোলা পানিতে গোসল সারত। জলদানোর উৎপাত থেকে রেহাই পেতে সে হাতে-কোমরে তাবিজ পরিধান করে। এসব আচরণ লোকাচারের অন্তর্গত।

১.৫ লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য বলতে লোকসমাজে প্রচলিত সহজ ভাষায় মুখে মুখে রচিত এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বাহিত বিভিন্ন ধরনের রচনাকে বোঝায়। শুধু গ্রামীণ জনজীবনের পরিসরেই লোকসাহিত্যের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ নয়। বরং একটি জাতির বা সম্প্রদায়ের জাতীয়-রাষ্ট্রীয় রূপ-রূপান্তর ও ক্রমবিন্যাসের স্তরগুলোর ছাপও লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যাতে রয়েছে লোকজচেতনার প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন উপাদান। আবেগ, অনুভূতি, কল্পনা ও উপলব্ধিকে প্রকাশ করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সেই তাড়নায় কখনো মৌখিকভাবে, কখনো লিখিত রূপে সে আপন ভাষায় নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। সাহিত্য সৃজনশীল মানুষের অর্থবহ এই প্রকাশ-বেদনার ফল। মৌখিক ধারার লোকসাহিত্য পূর্বে রচিত রয়েছে, লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছে পরবর্তীকালে। নজরুলের বিভিন্ন ছোটগল্পে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শাখাগুলো হল ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, রূপকথা, লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি, লোকসংগীত, পুথিপাঠ প্রভৃতি।

১.৫.১. ছড়া

গ্রামীণ সমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে কথোপকথন ও খেলাধুলার অনুষঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ছড়ার প্রয়োগ লক্ষণীয়। এটি কখনো নির্মল বিনোদনের উৎস, কখনো বা পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তরিকতা বা বিপ্রতীপ মানসিকতারও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কোন্দল, বিবাদ বা বৈরী মনোভাব, আক্রমণ ও রেষারেষি প্রভৃতিও ছড়ার মাধ্যমে তাদের মনোভাবনাকে প্রকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আবার বিভিন্ন লোকক্রীড়ায় ছড়া হয়ে ওঠে খেলার অংশ। সঠিকভাবে তা আবৃত্তি করা খেলার নিয়মের অন্তর্গত। এছাড়া শিশুকে ঘুম পাড়াতে বা তার বায়না মেটাতে ঘুমপাড়ানি ছড়া অভিভাবকদের প্রিয় অনুষঙ্গ। লেটোগানের[৩৪] ব্যবহার বালক-কিশোরদের পারস্পরিক সম্পর্কের ও মনস্তত্ত্বের প্রবণতারাশিকে ইঙ্গিতবহ করে। নজরুল সচেতনভাবেই এসব উপাদানকে একাধিক গল্পে সংযুক্ত করেছেন। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে শেষেরটি লেটোগান, অন্যগুলো প্রচলিত ছড়া।

ঘুম-পাড়ানি মাসি-পিসি ঘুম দিয়ে যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেবো গাল ভরে খেয়ো![৩৫]
রোদে রোদে বিষ্টি হয়,
খ্যাঁকশিয়ালের বিয়ে হয়।[৩৬]

১.৫.২ প্রবাদ

প্রবাদে লোকসমাজের বহুকালের অভিজ্ঞতার নির্যাস যেমন সঞ্চিত থাকে, তেমনিভাবে জাগতিক-সাংসারিক শিক্ষা, নীতিভাবনার সারবস্তুও পাওয়া যায়। লোকসমাজের প্রাত্যহিক কথোপকথনে প্রবাদের প্রয়োগ বক্তব্যের তাৎপর্যকে স্পষ্ট করে তোলে। স্বল্প পরিসরে লোকজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ধারণের অসাধারণ গুণ প্রবাদের বিশেষ দিক। বুদ্ধির ঝিলিক ও কৌশলী ইশারায় কখনো সরাসরি, কখনো পরোক্ষভাবে বিশেষ ইঙ্গিত প্রবাদে প্রতিধ্বনিত হয়। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে প্রযুক্ত কিছু প্রবাদের দৃষ্টান্ত :

টকের ভয়ে পালিয়ে এসে তেঁতুল-তলায় বাসা।[৩৭]
মানুষ মরে মিঠাতে, পাখি মরে আঠাতে![৩৮]
চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা।[৩৯]

১.৫.৩ প্রবচন

লোকসমাজে প্রচলিত জ্ঞানগর্ভ কথাকে প্রবচন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। নীতি-আদর্শ-অনুশাসনের পাশাপাশি লোকমানসে সঞ্জাত জীবনভাবনা বা জীবনদর্শনের বিচ্ছুরণ এতে লক্ষণীয়। প্রবাদের ভঙ্গিটি ক্ষেত্রবিশেষে কাব্যিক হলেও প্রবচনের উক্তি মূলত নিটোল গদ্য। সমষ্টিজনের বুদ্ধি, শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত প্রবচনে সরাসরি প্রকাশিত হয়। নজরুলের কিছু গল্পে এর প্রয়োগ নিম্নরূপ :

দুনিয়ার সবচেয়ে মস্ত হেঁয়ালি হচ্ছে মেয়েদের মন।[৪০]
পুরুষদের সাত খুন মাফ।[৪১]
শুভকাজে বিলম্ব করা ভালো নয়[৪২]

১.৫.৪ লোককথা-উপকথা

লোকসমাজের বিভিন্ন কল্পনা, স্বপ্ন, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষার পরিচয় রূপকথা-লোককথা-উপকথায় মেলে। বাস্তবতার সমান্তরালে অলৌকিক-অতিলৌকিকের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ লোকমানসে সন্নিহিত আবেগ, ভালোলাগা, বিশ্বাস, কামনা, সম্ভাবনা, প্রত্যাশা এবং আশঙ্কা বিভিন্ন রূপক-প্রতীকের অনুষঙ্গে এতে উপস্থিত থাকে। এর পাশাপাশি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নৈতিকতা, সংস্কার, পারিপার্শ্বিক সমাজবাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণ বিভিন্নভাবে এসব উপাদানে প্রতিফলিত হয়। মৌখিকভাবে প্রজন্মান্তরে বহমান এসব উপাদানে প্রাচীনকালের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন সংরক্ষিত থাকে, তেমনিভাবে তা বর্তমানকালেও পাঠক-শ্রোতার বিনোদন ও চিত্তসন্তুষ্টির ভাণ্ডার হিসেবে ভূমিকা রাখে। নজরুলের বিভিন্ন গল্পে এসব উপাদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন,

লোককথা–

> প্রেমিকদের সোনার কাঠির স্পর্শে আমি-যে-আমি, তারও আর কোন গ্লানি নেই, সঙ্কোচ নেই[৪৩]
>
> এটা যে একটা পাতালপুরী, দেও আর পরিদের রাজ্যি, তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনে![৪৪]
>
> সাপ যেমন মানিক ছেড়ে তার সেই মানিকটুকুর আলোর বাইরে যেতে পারে না, আমারও হয়েছে তাই।[৪৫]
>
> তখন সাঁঝের রানির কালো ময়ূরপঙ্খী ডিঙিখানা ধূলি-মলিন পাল উড়িয়ে সাগর বুকে নেমেছে।[৪৬]

উপকথা–

> হাতি যখন ভাবে, তার চেয়ে বড় জানোয়ার আর নেই, তখন ছোট্ট একটি মশা তার মগজে কাম্‌ড়ে কিরকম 'ঘায়েল' করে দেয় তাকে।[৪৭]
>
> ভেড়ার দলে যখন নেকড়ে বাঘ প্রবেশ করে তখন সমস্ত ভেড়া একসঙ্গে জুটে চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুঁজে মাথা গুঁজে থাকে, মনে করে তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না।[৪৮]

১.৫.৫ কিংবদন্তি

সত্য, মিথ্যা, সম্ভাবনার সমাহারে লোকমুখে প্রচলিত বিভিন্ন ভাবনা, ধারণা বা বিশ্বাসকে কাহিনির মাধ্যমে বহুযুগ ধরে প্রচলনের মাধ্যম হিসেবে অবলম্বিত কাহিনি, কথা, গল্পগুলোই কিংবদন্তি হিসেবে পরিচিত। এতে প্রাচীন বা সমকালীন ইতিহাসের নির্যাস থাকতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে সেটি পরিবর্তিতভাবেও লোকসমাজে প্রচলিত থাকে। কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস বা প্রামাণিক দৃষ্টান্ত হিসেবে এর সাক্ষ্য ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তথ্য ও সম্ভাবনার নির্যাস কিংবদন্তিতে অধিক গুরুত্ব পায়। ব্যক্তির পাশাপাশি বিভিন্ন বস্তু, ঐতিহাসিক নির্মাণ বা স্থাপত্যকে নিয়েও কিংবদন্তি লোকসমাজে প্রচলিত থাকে। নজরুলের ছোটগল্পে এর দৃষ্টান্ত–

> ঐ যে বাঁধানো কবরগুলো, ওগুলো অনেক কালের পুরানো। তখন ছিল বাদশাহি আমল, আর আমাদের এই ছোট্ট গ্রামটাই ছিল 'ওলিনগর' বলে একটা মাঝারি গোছের শহর। ঐ যে সামনে 'রাজার গড়' আর 'রানির গড়' বলে দুটো ছোট্ট পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, ওতেই থাকতেন তখনকার রাজা রানি–রাজকুমার আর রাজকুমারীরা। লোকে বলে, তাঁরা শুতেন হীরার পালঙ্কে, আর খেতেন 'লাল জওয়াহের'। আর, কবরস্থানের পশ্চিম দিকে ঐ যে পির সাহেবের 'দরগা' ওরই 'বর্দোয়ায়' নাকি এমন সোনার শহর পুড়ে ঝার হয়ে যায়। সেই সঙ্গে রাজার ঘরগুষ্টি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আজ তাঁর বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। পশ্চিমে-হাওয়ায় তাঁদের সেই ছাই-হওয়া দেহ উড়ে উড়ে হয়তো এই গোরস্থানের উপরই এসে পড়েছে।[৪৯]

১.৫.৬ লোকসংগীত

লোকসংগীত হলো লোকসমাজের বাসিন্দাদের অন্তর্গত আবেগ, ভাবনা, সুর, তাল, ছন্দময় গীতোচ্ছ্বাস, যা তাদের নিত্যদিনের বোঝাপড়া, পারস্পরিক সম্পর্ক, ওঠাবসা ও মানবীয় বন্ধনকে গানের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ঐতিহ্যের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ ও ব্যক্তিক উপলব্ধিকে সমষ্টিজনের জন্য প্রকাশের আকুলতা লোকসংগীতের সম্প্রসারণের ভিত্তি। অন্তর্গত আবেগ, সংবেদনা, কল্পনা এবং অনুভবকে বাণীময় কাঠামোতে ধারণের গুণে এর আবেদন লোকসমাজে অধিক সমাদৃত। নজরুলের গল্পে এর দৃষ্টান্ত–

লোকগীতি

পরের জন্য কাঁদ রে আমার মন,
হায়, পর কি কখন হয় আপন?[৫০]

১.৫.৭ পুথিসাহিত্য

বাঙালি মুসলিম গ্রামীণসমাজে আঠারো শতকের শেষভাগে ধর্মীয়-অলৌকিক কাহিনিবিশিষ্ট একধরনের কাব্যের বহুল প্রচলন ছিল। এসবের বিষয়বস্তু ছিল আরব-ইরানের লোককাহিনি ও রোমান্সধর্মী রচনার প্রভাবে রচিত নবী-রসুলদের জীবনকাহিনি, সেখানকার বীর ও যোদ্ধাদের বৃত্তান্ত, প্রেমাখ্যান, দুঃসাহসিক অভিযাত্রা ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধগাথা প্রভৃতি। উনিশ শতক অবধি এ ধারা লোকসমাজে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। লোকসমাজের চিত্তবিনোদনের উৎস হিসেবে পুথিপাঠের আসর বসিয়ে শ্রোতাদের উপভোগের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রাসঙ্গিক দিক। 'জিনের বাদশা' গল্পে এ প্রসঙ্গের বিভিন্ন উল্লেখ লক্ষণীয়:

> একদিন হঠাৎ আল্লা-রাখার 'সোনাভানে'র পুথি পড়তে পড়তে মনে হল, চান ভানুই সে সোনাভানবিবি এবং সে গাজি হানিফা। তার কারণ, চানের চেয়ে সুন্দরী মেয়ে গাঁয়ে ছিল না। ... আল্লা-রাখা তার বাবরি চুলের মাঝে একটা এবং দুদিকে দুটো–এই তিন তিনটে সিঁথি কেটে, চুলে, গায়ে, জামায় বেশ করে কেশরঞ্জন মেখে, গালে বেশ করে পান ঠুসে সোনাভান ওর্ফে চান ভানুকে জয় করতে বেরিয়ে পড়ল।[৫১]

১.৬ ধর্মীয় লোকজ উপাদানের সমাবেশ

নজরুল পারিবারিক ও বংশপরিচয়গত সূত্রে ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও সনাতন ধর্মের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সংযোগ গড়ে উঠেছিল বাল্যকাল থেকেই। যে চুরুলিয়ায় তিনি বড় হয়েছিলেন, সেখানে ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বসবাসের ঐতিহ্য। নজরুলের পিতা ফকির আহম্মদ বাংলা ও উর্দুতে পণ্ডিত ছিলেন। পাশাপাশি আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা-সাহিত্যের চর্চা কাজী পরিবারে দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। মক্তবের মৌলবি কাজী ফজলে আহম্মদের নিকট আরবি ও ফারসিতে নজরুলের হাতেখড়ি হয়। এর পাশাপাশি পিতৃব্য ও লেটো ওস্তাদ কাজী বজলে করিম বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ফারসি প্রভৃতি মিশ্র ভাষায় কবিতা লিখতেন। এসব কিছুর মিথস্ক্রিয়ায় ইসলামী ঐতিহ্য ও অনুষঙ্গের সঙ্গে নজরুলের পরিচিতি নিবিড় হয়ে ওঠে।[৫২] অসাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির আত্মপ্রকাশ নজরুলের সমুদয় সৃষ্টিশীলতার অন্যতম দিক। বিভিন্ন ছোটগল্পে তিনি

লোকমানসে প্রচলিত ইসলামী ও সনাতন ঐতিহ্যবাহী প্রসঙ্গ, চরিত্র ও পুরাণকে নিজস্ব শিল্পভাবনার আলোকে বিন্যস্ত করেছেন। যেমন,

ইসলামী অনুষঙ্গ–

ইসরাফিলের শিঙ্গা, তুমি বাজো সবকে নিসাড় করে দিয়ে।[৫৩]

এখানে (কারবালা) এসেই মনে পড়ে সেই হাজার বছর আগের ধর্ম আর দেশ রক্ষার জন্যে লক্ষ লক্ষ তরুণ বীরের হাসতে হাসতে 'শহীদ' হওয়ার কথা![৫৪]

সনাতন অনুষঙ্গ–

মধু ভেবে আকণ্ঠ হলাহল পানের তীব্র জ্বালায় ছটফট করছি[৫৫]

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যার কূল-কিনারা পান না, তাকে ধরবেন 'পদীর ভাই গৌরীশঙ্কর'।[৫৬]

ছুড়িটা ঐ শিবের মতন সোজা ভোলানাথ সোয়ামিকে আমার পেয়ে বসল।[৫৭]

১.৭ লোকভাষা

লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন লোকগোষ্ঠীর ভাষা অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়, যার নেপথ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের সমন্বিত অভিঘাত। ভাষা মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মৌলিক বাহন। তবে এর ভূমিকা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সভ্যতার আদিম পর্যায় থেকে বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে মানুষ যে সভ্যতার বর্তমান অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে, এক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকাই প্রধান। নজরুলের একাধিক ছোটগল্পে লোকভাষার বৈচিত্র্যময় রূপায়ণ নিম্নরূপ:

ঘ. আজ এই পুরো দুটো বছর ধরে ভাবছি, শুধু ভাবছি,– আর সবচেয়ে আশ্চয্যি হচ্ছি, লোকে আমাকে দেখলেই এমন করে ছুটে পালায় কেন। ... মেয়েরা আমায় দেখলেই কাঁক হতে দুম করে কলসি ফেলে সে কি লম্বা ছুট দেয়! ছেলেমেয়েরা তো নাকমুখ সিঁটকে ভয়ে একেবারে আঁৎকে ওঠে। হাজার গজ দূর থেকে বলে, 'ওরে বাপরে, ঐ এল পাগলি রাক্ষুসী মাগি, পালা–পালা! খেলে, খেলে!' –কেনে। আমি কোন উনোনমুখো সুঁটকোর পাকা ধানে মই দিয়েছি? কোন খালভরা ড্যাকরার মুখে আগুন দিয়েছি? কোন চোখখাগি আবাগির বেটির বুকে বসে তপ্ত খোলা ভেঙেছি? কার গতর আমকাঠ না কুল-কাঠের আখায় চড়িয়েছি? কোন ছেলেমেয়ের কাঁচা মাথাটা চিবিয়ে খেয়েছি?[৫৮]

ঙ. আলি নসিব মিঞা সব বুঝলেন। কিন্তু বুঝেও তিনি কিছুতেই হাসি চাপতে পারলেন না। হেসে ফেলে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি হইছে রে বেডি? ছেমরাডা প্যাঁচার লাহান বাড়িত বইয়্যা রইব, একডা কথা কইব না, তাইনাসেন উয়ারে প্যাঁচা কয়।' নূরজাহান রেগে উত্তর দিল, 'আপনি আর কইবেন না আব্বা, হে বেডায় ঘরে বইয়া কাঁদে, আর আপনি হাসেন। আমি পোলা অইলে এইদুন একচটকনা দিতাম বুস্তম্যারে আর উই ইবলিশা পোলাপানেরে, যে, ঐ হ্যানে পইর‍্যা যাইত উৎক্যা মাইরা। উইঠ্যা আর দানা-পানি খাইবার অইত না!' বলেই কেঁদে ফেললে। ... আলি নসিব মিঞা মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'চুপ দে বেডি, এইবারে ইবলিশের পোলারা আইলে দাবার পাইর‍্যা লইয়া যাইব! মুনশি বেডারে কইয়্যা দিবাম, হে ঐ বুস্তম্যারে ধইরা তার কান দুডা এক্কেরে মুত্যা কইর‍্যা কাইট্যা হালাইবো!'[৫৯]

'ক' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে স্বামীহত্যার দায়ে দণ্ডপ্রাপ্ত, গ্রামবাসীর দ্বারা অবহেলিত, প্রতিবাদী বীরভূমের বাগদি নারী বিন্দির বিড়ম্বিত জীবনের পরিহাস উপস্থাপনায় লেখক তার সংলাপে স্বতন্ত্র ভাষাবিন্যাসকে সংযোজিত করেছেন। ক্রিয়া, বিশেষ্য ও বিশেষণের আঞ্চলিক উচ্চারণ, বাগধারা, প্রবাদ, আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গে লৌকিক শব্দ ও গালিগালাজের সমাহারে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার

বিরুদ্ধে বিন্দির বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী সত্তার স্ফুরণ ঘটেছে। সেই নারীর ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, আক্রোশ, হতাশা ও ক্রোধের অকপট আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে এ উদ্ধৃতিতে বিরামচিহ্নের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষণীয়। 'খ' সংখ্যক উদ্ধৃতিতে পিতা-কন্যার পারস্পরিক সংলাপের অবলম্বন ময়মনসিংহের উপভাষা। একের প্রতি অন্যের আবেগানুভবের উপস্থাপনায় লেখক ব্যবহার করেছেন হাস্য-পরিহাস, বাগধারা, লোকজ উপমা, অপ্রচলিত গ্রাম্য শব্দ, ধর্ম-সংক্রান্ত গালিগালাজ, ক্রিয়া-বিশেষ্য-বিশেষণের আঞ্চলিক রূপকে। প্রত্যুত্তরবাচক সংলাপের ধারাবাহিকতা এ উদ্ধৃতিতে রক্ষিত হয়েছে শানিত অথচ লক্ষ্যভেদী শব্দসমূহ চয়নের অনায়াস নৈপুণ্যগুণে।

নজরুল নতুন সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন দেখতেন, এর কলাকুশলীরা ছিল গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া লোকসমাজের বাসিন্দা। তাদের পরিশ্রমক্লিষ্ট জীবিকা, আবহমান কাল থেকে বাহিত লোকসংস্কৃতির প্রতি তাদের অনুরাগ এবং নিজস্ব ধরনের জীবনচর্যা–প্রভৃতি অনুষঙ্গের সমবায়ে তিনি লোকজচেতনার শিল্পভাষ্য বিভিন্ন ছোটগল্পে গ্রন্থিত করেছেন। লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলো বহুযুগ ধরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহন করে লোকসমাজের বাসিন্দাদের জীবনভাবনা, বিশ্বাস-সংস্কার-মূল্যবোধ, প্রত্যাশা-স্বপ্ন ও সৃষ্টিশীলতার বৈচিত্র্যময় নমুনা। গল্পকার নজরুল গণমানুষের মুক্তি ও কল্যাণের যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তাই লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির অদ্বৈত সম্পর্ককে শিল্পভাষ্যে রূপায়ণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এটিই একজন কালজয়ী শিল্পীর সাহিত্যসাধনার অনন্য দৃষ্টান্ত। তাই তিনি কাল থেকে কালোত্তরে অমর, চিরভাস্বর মহিমায় উচ্চাসীন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ বাংলা কথাসাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবের বাহন ছিল ছোটগল্প। 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' (সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬) শীর্ষক ছোটগল্প তাঁর প্রথম সাহিত্যকর্ম। এছাড়া তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থটিও হলো গল্প সংকলন *ব্যথার দান*। তিনি 'আমার সুন্দর' শীর্ষক প্রবন্ধে জানিয়েছেন–

> আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটগল্প হয়ে তারপর এলেন কবিতা হয়ে। তার পর এলেন গান, সুর, ছন্দ ও ভাব হয়ে। উপন্যাস, নাটক, লেখা (গদ্য) হয়েও মাঝে মাঝে এসেছিলেন। [*নজরুল-রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৭]

২ লোকজ উপাদান বলতে লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত উপাদানসমূহকে বোঝায়। সংস্কৃতি বলতে মানবজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সকল প্রক্রিয়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ লোকসমাজের বাসিন্দাদের অভ্যাস, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, মূল্যবোধ, খাদ্যাভ্যাস, পেশা, শখ, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতির সমবায়ে গড়ে ওঠা সামগ্রিক অভিব্যক্তিই লোকসংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়। যেসব প্রাকৃতিক উপাদানকে লোকসমাজের বাসিন্দা বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে ব্যবহারোপযোগী করে তোলে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন উপযোগিতা মেটাতে এবং যাতে তার অন্তর্গত সৃষ্টিশীলতা, সম্ভাবনা ও সাংস্কৃতিক বোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিজস্ব ভঙ্গি ও কৌশলে, সেগুলোকেই লোকজ উপাদান বলে। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে জানতে দ্রষ্টব্য : তাশরিক-ই-হাবিব, *বাংলাদেশের উপন্যাসে লোকজ উপাদানের ব্যবহার*, পরানকথা, ঢাকা, ২০২৪।

৩ 'লোকজচেতনা' শব্দবন্ধটি লোকসমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টির ভাবনা ও ধারণাগত রূপরেখার ইঙ্গিতবহ, যা তাদের মানসগঠন ও অবস্তুগত সাংস্কৃতিক চিহ্নরাশিকে বিশিষ্টরূপে দ্যোতিত করে। 'লোক' বলতে সমষ্টিবদ্ধ যে মানুষদের বোঝায়, তাদের রয়েছে নির্দিষ্ট সামাজিক পরিচয়, বংশপরম্পরাগত পেশা অবলম্বনের প্রবণতা, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, স্বকীয় জীবনবোধ ও ধর্ম-দর্শনভাবনা। বিভিন্ন লোকবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানী, 'লোক'-সম্পর্কিত ধারণা প্রকাশের সূত্রে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রাসঙ্গিক অভিমত উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো

মারিয়া লিচ সম্পাদিত দুই খণ্ডের *Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*। (শেখ মকবুল ইসলাম, *লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান : তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮৫)

৪ সৈকত আসগর, *নজরুলের গদ্যরচনা : ভাবলোক ও শিল্পরূপ*, অস্ট্রিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ২৪

৫ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৮৪

৬ *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৬

৭ সুকুমারী ভট্টাচার্য, *নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ*, ক্যাম্প, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৭

৮ আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১

৯ *লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৬০

১১ *নজরুল-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১

২০ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয়* খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০-২৮১

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

২২ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭

২৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২৪ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১

২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭

২৬ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

২৭ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয়* খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪১

২৮ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২৪৩

২৯ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৩০ ওয়াকিল আহমদ, *লোকসংস্কৃতি*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩১৭

৩১ মোমেন চৌধুরী, *বাংলাদেশের লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান : জন্ম ও বিবাহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১

৩২ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

৩৪ কল্পতরু সেনগুপ্ত, *জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১১

৩৫ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

৩৬ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮

৩৭ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

৩৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৪০ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২
৪১ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
৪৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
৪৬ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০
৪৭ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৪৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
৫০ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৫১ *নজরুল-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪
৫২ কমলচন্দ্র মণ্ডল, *কালজয়ী নজরুল*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ২৬
৫৩ *নজরুল-রচনাবলী*, *প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৫৪ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭
৫৫ *নজরুল-রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
৫৬ *নজরুল-রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
৫৮ *নজরুল-রচনাবলী*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪
৫৯ *নজরুল-রচনাবলী*, *চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০